সরলরেখা

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বর কোন ধাতুতে গড়া, তামা কিংবা রূপো, এলুমিনিয়াম কিংবা সোনা? কারণটা আর কিছু নয়, এই সব ধাতুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে যায় টপ করে। ঈশ্বর যে বিদ্যুতের খুব কাছাকাছি তাতে বেশি ভুল নেই। আরও যদি বেশি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তো দেখা যাবে আত্মারা, পরিস্কার করে বললে মৃত মানুষের আত্মারা, যারা আমাদের কাছেপিঠেই আছে বলে বলা হয়, তারাও অনেকটা ঈশ্বরের মত। সুতরাং তাদের যে কী ধাতু হবে কে বলে দেবে? বিল্টুর মতো যন্ত্রপাতির কারবারির কাছে লোহা লক্কর নাট বল্টু এমনকি একটা গোটা জাহাজও সোজা সাপটা জিনিস। তাদের ধরা যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, হাত দিলে বোঝা ঠাণ্ডা না গরম। কিন্তু ঈশ্বর? সে যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এত কথা বলার দরকার হত না। ভূত কিংবা আত্মা কিংবা ঈশ্র তিনটেই মানে বিল্টু। অতএব তার কাছে সবাই সামন, একও বলা যায়। কিন্তু আত্মা, সে স্বতন্ত্র জিনিষ, অন্ততঃ ভূতের থেকে অলাদ। বিদ্যুতের মতই তাঁদেরও দেখা যায় না, চুঁলে শক লাগতে পারে। কে জানে? ইদানীং এইসব নিয়ে ভাবার দরকার হচ্ছে।

তার দাদু ঠিক ঊনষাট বছর বয়সে মারা গেছেন। রিটায়ার করার পরের বছর এই বাড়িতেই দাদু দেহ রেখেছেন। বিল্টুর তখন জন্ম হয়েছে কিন্তু কিছু মনে নেই, থাকার কথাও নয়। হামাগুড়ি দেওয়া শিখেছে সবে। তাহলে এই বাড়িটার বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। সিউড়ির ডাঙালপাড়ায় বড় রাস্তার ওপর আটকাটা জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়ি আর বাদান। তখন মনে হয় এদিকে কেউ আসত না, নইলে এতটা জায়গা দাদু কিনতে পারতেন না। বাড়িটা দাদু ভোগ করতে পারেননি, এক বছরের মাথায় চলে যান।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সামনের দরজার খিল খুলে সতর্ক নাবিকের মত বাইরে এল বিল্টু। সতর্কতার প্রয়োজন হয়ত নেই, তবু বলা কি যায়? নতুন জায়গা নতুন শহর, আনকোরা আমদানি হয়েই বেশি হৈ হৈ করা কী উচিত? বিশেষ করে নতুন জায়গায় ভোরবেলাটার পরিবেশটা মন্দ লাগছে না। আলো ফুটেছে অথচ লোক নেই একটাও রাস্তায়। এদিককার লোকেরা সকাল সকাল বিছানা ছাড়ে না মনে হয়। এত পাখি, গাছে গাছে এত কলরব, উত্তেজনা, লোকে ঘুমোয় কি করে? চারিদিকের নিশ্চিন্ততার আবহাওয়া দখে নিশ্চিন্ত হল নিজেও। সমুদ্রের মধ্যেও বিল্টু সদা সতর্ক থাকে। ওটা তার বহুদিনের অভ্যাস। জাহাজে জাহাজে সমুদ্রে ঘোরার জঘন্য ডিউটির মধ্যেও সে সদা সতর্ক মানুষ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলে কথা। এতগুলি মানুষ এত কোটি টাতার সম্পত্তি তার জিম্মায়।

বাগানে নেমে সকালের ভিজে ভিজে সোঁদা মাটির গন্ধ পেল। শিশিরে ভেজা মাটির গন্ধ পাওয়া যায় কী? য়ায় হয়ত, যেমন এখন সে পাচ্ছে। দাদুর বাড়ির গন্ধ, নিজেদের বাড়ির মাটির গন্ধ, অথবা সকাললো গাছপালা ছুঁয়ে যাওয়া হাওয়ার গন্ধ, সব পাওয়া যাচ্ছে। দুমাস থাকবে বলে বউ বাচ্চা নিয়ে এসেছে এখানে এই সিউড়ির বাড়িতে। এখন ছুটিটা ভালভাবে কাটলে হয়।

এই সব বদ অভ্যাস সুমিত্রা একদম পছন্দ নয়। জাহাজে সব সময় জলের ওপর থেকে থেকে এক ধরনের আতঙ্কে দম আটকে রাখা মানুষকে নিয়ে তার হয়েছে বেশ মুস্কিল। কেন, এখানে এই শক্তপোক্ত লাল ধুলোর দেশে কিছু ঘটবে বলে মনে হয় ওর? যত সব উদ্ভুট চিন্তা। বরঞ্চ কালকে দাদুর বাড়ি এসে বেশ একটা শ্বশুরবাড়ি শ্বশুরবাড়ি অনুভূতি হয়েছে। অন্ততঃ তাদের নাগপুরের হিংনার বিচ্ছিরি বাড়িটার চেয়ে এটা কত ভাল। সামনে একটু দূরে রাস্তা, কত লোকজন যায়, সাইকেল, রিক্সা, বাস, মোটরকার। মানুষ আছে, মানুষের তৈরি শব্দ আছে, প্রাণ আছে জায়গাটায়। হিংনার মত মড়া মানুষের পাড়া নয়। কেন যে মরতে অমন জায়গায় বাড়ি করেছিলেন দাদা - শ্বশুর? দাদু ফ্যাক্টরি ইনস্পেক্টর ছিলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার কাছাকাছি জায়গা কিনে বাড়ি করেছিলেন। সেটা তাঁর পক্ষে সুবিধের ছিল, তাঁর ছেলের কিংবা নাতির কারোরই সুবিধে হয়নি। শহরের বাইরে একদম ফাঁকা জায়গা একটা। ত্রিসীমানায় মানুষের বসতি নেই। হিংনা লোকের ধারে হোটেলটা হবার পর থেকে তবু এক আধটা যাহোক গাড়ি দেখা যায়। তাই নইলে সারা দিন চুপচাপ, মরলে কাউকে তক্ষুনি ডেকে আনা যাবে না।

তবে জায়গাটা ভাল, সুন্দর পরিবেশ। হৈ হট্টগোল একদম নেই। সুন্দর হাওয়া বাদাস। এবং সুন্দর গরম। কে না জানে নাগপুরে কেমন গরম পড়ে। সারা বিদর্ভ জ্বলে পুড়ে তামার মত হয়ে থাকে পুরো গ্রীষ্মকালটা। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর এমন কি বেশি? ঘন্টাখানেকে বাইরে থাকলে হিট-স্ট্রোক অবধারিত। সে যাই হোক এই লোকটাকে নিয়ে হয়েছে খুব মুস্কিল। হুরো ছমাস জলে জলে কাটিয়ে দুমাসের ছুটি নিয়েছে সিউড়ির বাড়িটার একটা গতি করতে হবে বলে। পয়সার জন্যে নয়, একদম খালি পড়ে আছে তিন মাস হয়ে গেল। স্টেট ব্যাঙ্ক খালি করে দেবার পর থেকে পড়ে আছে। বিক্রি করা সহজ কাজ নয়, ভাড়া দেবার তার থেকে অনেক সোজা। বাবা বেঁচে থাকতে নিচের তলাটা ব্যাঙ্ককে লীজ দেওয়া হয়েছিল, ত্রিশ বছর ধরে লীজটা বাড়ান হয়েছে বারে বারে। এখন স্টেট ব্যাঙ্কের নিজেদের বাড়ি হয়েছে।

একছেলে হওয়া একদম ভাল নয়। দাদু নিজে একছেলে ছিলেন, বাবা এক ছেলে ছিলেন, বিল্টু, মানে বিল্লেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে জাহারিরা বিবি স্যার বলে ডাকে, তিনিও এক ছেলে। আর সুমিত্রারও একটিমাত্র ছেলে। এরা পুরুষানুক্রমে এক ছেলের বংশ। একটা পিসি নেই, ননদ নেই, দেওর নেই, ভাল লাগে ছাই? তারপর তিনি যাবেন জাহাজে, তিন মাস চার মাস পরে বাড়ি আসবেন। এসে খাওয়া আর ঘুম।

বিয়েটা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল সুমিত্রার। জাহাজে জাহাজে ঘোরে, কেমন লোক হবে কে জানে? সতুকাকু বলেছিলেন - বিল্টু মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু মদ ছোঁয়া না। আমার চেয়েও চরিত্র ভাল। আমি নিজে খুব ভাল করে জানি বলেই বলছি। একটাই দোষ, ছেলেটা একটু ভীতু টাইপের। আমার নিজের ভাগ্নে, আমি ভাল করে জানি বলেই তোকে বিয়ে করতে বলছি।

তা ভূতু হহওয়া খারাপ কিছু নয়, কি বল?

—মিতু জানিস, বিল্টু কত টাকা মাইনে পায়? জিতুদা বলেছে মাসে দেড়লাখ টাকা পায়। কাউকে বলিস না। লোকের চোখ টাটাবে।

মা এইসব কথা বলতে বলতে কেমন উজ্জ্বল চোখে দেখেছিল, মেয়ের ভাগ্যে খুসি হয়েছিল খুব। মা খালি টাকার ব্যাপারটা বুঝল, মানুষটা কেমন সেটা দেখল না। অবশ্য তার নিজেরও ভাল মনে হয়েছিল নতুন নতুন বিয়ে হয়ে। আর এখন? এখন মানুষটাই বাড়ি থাকে না মাসের পর মাস, টাকা নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খাবে? তার যখন খুব ইচ্ছে হয় তখন সে হয়ত তাহিতি নাকি কোন অদাখ্য জায়গায় নোড়র ফেলে বসে আছে। কি খারাপ লাগে তখন।

বিয়েটা খুব ভাল হয়েছে সে কথা মানুতে পারবে না মিতু। হিংনার বাড়ি আছে, সিউড়িতে বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে অজস্র টাকা আছে, কিন্তু তাতে কী সব হয়? এইরকম একটা ভীতু ভীতু মানুষকে নিয়ে ঘর করতে যাকে হয় সেই জানে ব্যাপারটা কত অন্যায়, কত অসহ্য। বছরে মেরে কেটে বার তিনেক বাড়ি আসবে, প্রতিবার পনের কুড়ি দিন। সব মিলে মাস দুয়েক হয়ত বাড়ি থাকে। কী নাকি কন্ট্রাক্ট করা আছে। শিপিং কোম্পানির সঙ্গে। এমন জানলে বিয়েই করত না। তিন-চারমাস অন্তর বরকে মাত্র পনের কুড়িদিন কাছে পেয়ে মন ভরে? এ যেন তিন দিন না খেয়ে একদিনে তিন দিনেরটা খেয়ে নাও। সেটা সম্ভব না উচিত? অমন কন্ট্রাক্টের মুখে ঝ্যাঁটা মারা উচিত। ছেলেটা হবার পর থেকে তবু যাহোক কিছু কাজ রয়েছে হাতে, নইলে কি করত ভাবতে পারে না এখন।

কাল দুপুরে এই বাড়িটাতে পা দিতে খুব ভাল লেগেছিল। দোতলা বাড়ি, সামনে পেছনে বাগান, বড় বড় গাছ। কী চমৎকার হাওয়া?

সকালবেলাটা সব দেশেই এক রকমের। সে সাওপাওলো হোক কিংবা সালভাদর, ম্যানচেষ্টার হোক কিংবা ম্যানহাটান। সকালবেলাটা বেশ তৃপ্তি আনে মনের ভেতর, কেমন আধ্যাত্মিক বোধ জাগে, যার সঙ্গে ভগবান বা ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। ওটা অনেকটা শরীর মনের ফ্রেশনেশ থেকে হয়। সারা রাতের ঘুমের পর মানসিক আরামের থেকে অমন বোধ হওয়া খুব স্বাভাবিক। অবশ্য সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখে আনন্দ হবার বদলে দুঃখ হয়, মনে হয় আবার শুরু হল একটা নীরস দিন। মাইনে দেয় অনেক, বলে কমপেনসেশন। দুঃখ দিয়ে দান আর পিত্তি পরিয়ে আহার একই কথা হল। ঘর বাড়ি ছেড়ে জাহাজে দুলতে দুলতে চাকরি করার কমপেনসেশন।

প্রশ্ন হল জলের ওপর ভাসতে থাকা বা দুলতে থাকা জাহাজে আত্মারা থাকেন সেটা সবারই জানা, এবং মোটেই ভায়ের কারণ নয়। কিন্তু তাঁদের মানতে হয়, ব্যস তাতেই তাঁরা খুশি হন। জীবিত লোকের সান্নিধ্য ছাড়া তাঁরা যাবেন কোথা? ধারে কাছে দু-চারশ কিলোমিটার জলের মধ্যে একমাত্র জায়গা ওই জাহাজটা। অতএব রান্নাঘরের পেছনের স্টোররূম কিংবা ইঞ্জিন ঘরের পাশে টুলরুমে ঢুকলে যদি ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক তাতে ভয়ের কিছু নেই। সেখানে তাঁরা আছে, থাকেন, বাস করেন। এসব জানা কথা, নতুন কিছু তো নয়?

বাড়িতে পরার চটি খুলে শুকনো লাল মাটিতে পা রাখল বিবি সাহেব। ব্যাঙ্কের নিশ্চয় একজন মালি ছিল, বেশ ভাল ভাল গাছ লাগিয়েছে চারিদিকে। গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিন মাস জল না পেয়ে ছোট ছোট ফুলের গাছগুলো সব শুকিয়ে গেছে। সামনে পেছনে দুটো কাল আছে, তাতে জলও আছে। সময়মত জল দেওয়া হয়নি, গাছের কী দোষ? নতুন ভাড়াটে এলে তারা যাহোক করবে। খালি পায়ে ঘুরতে লাগল বিল্বেশ্বর।

—বিল্বেশ্বর মিনস্ হোয়াট বিবি? তোমাদের ইন্ডিয়ানদের আবার নামের একটা করে মিনিং থাকে বলে জানি।

প্রশ্নটা করেছিলেন তাকে সিঙ্গাপুরের হেড অফিসের পার্সোন্যাল ডিরেক্টর লি ফাং। সত্যি সেদিন তাকে জবাব দিয়ে খুব খুশি হয়েছিল বিল্টু। সংস্কৃতে বিল্ব মানে বেল, একটা ফল বিশেষ, তার ঈশ্বর মহাদেব। দি গ্রেট গড শীভা। শীভা খুব খুশি হন বেল গাছের পাতা আর জল পেলে। ট্রিনিটির একজন হলেন শিভা। বেলের ঈশ্বর। বিল্বেশ্বর।

কিন্তু যত ভাবেই বোঝাক, বিল্টু নিজেও জানন এরকম নাম রাখার জন্যে দাদুকে খুব বকে দেওয়া উচিত। এটা কি একটা নাম হল? বিল্বেশ্বর কারো নাম হয়? আর বাবাই বা কি করে এমন একটা উদ্ভট নামে স্বীকার করে নিলেন ছেলের? তা যদি বলা হয় তাহলে লি ফাং আবার একটা নাম নাকি। সিঙ্গাপুরের চীনেদের অর্ধেকের নামই লি দিয়ে। যার নিজেরই নামের ঠিক নেই সে আবার অন্যের নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু বাবা বিল্বেশ্বর মহাদেব কোথায় আছে আজ পর্যন্ত বিল্টু জানে না। চেষ্টা করেও জানা যায়নি। তা সত্ত্বেও বিল্টুর নাম বিল্বেশ্বর।

বাড়িটা পেছন দিকের অংশটা বেশ সুন্দর। মালীটা কাজের ছিল বলতে হবে। বাগানটা সাজিয়েছে ভাল করে। জলের কলটা মাঝামাঝি জায়গায়, তার কাছে চারপাশায় কেয়ারি করা ফুলের বেড। ফুলগাছগুলো সব শুকিয়ে গেছে। বেশ যেন নক্সাকরা বাগানটা। তিনদিকে তিনটে পাঁচকোনা ফুলের বেড, চমৎকার ডিজাইন, সাধারণত দেখা যায় না। প্রতিটি বেডেই গাছ আছে, শুকনো। কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে কি একই মালী কাজ করেছে? নিশ্চয় না। তাহলে কার হাতের কাজ এটা হতে পারে? তাকে ডেকে এনে বলা যায় বাড়িতে কেউ থাকুক আর না থাকুক, সে যেন জল টল দেয় গাছে। শুকনো শুকনো ফুলের বেড বড় চোখে লাগে।

শুকনো মাটির ওপর খালি পা, কাঁকর লাগছে পায়ের নীচে। তবু খারাপ লাগছে না দাদুর গোছালো শুকনো বাগানে ঘুরতে। একোণ থেকে শুরু করে একপা একপা করে ওদিকের দেওয়ালের কাছাকাছি যেতে গিয়ে এক জায়গায় পা ফেলার সঙ্গে শক লাগার মত লাগল পায়ে। পা-টা তুলে নিল বিল্টু। কিসের লাগল একবার নজর করে দেখল সে। কোন পাথর কিংবা কাঁটা নেই সেখানে। আবার পা ফেলতে ছ্যাঁক করে লাগল। তৃতীয় বারেও একই রকম লাগল তার। ব্যাপারখানা কি দেখার জন্যে ঝুঁকে নীচু হল সে।

ওদিকের দেওয়ালের কাছাকাছি যেতে গিয়ে এক জায়গায় পা ফেলার শঙ্গে শক লাগার মত লাগল পায়ে। পা-টা তুলে নিল বিল্টু। কিসে লাগল একবার নজর করে দেখল সে। কোন পাথর কিংবা কাঁটা নেই সেখানে। আবার পা ফেলতে ছ্যাঁক করে লাগল। তৃতীয় বারেও একই রকম লাগল তার। ব্যাপারখানা কি দেখার জন্যে ঝুঁকে নীচু হল সে।

— ও কি, ওখানে কি করছ? মিতু কখন এসেছে বোঝা যায়নি, পেছন থেকে লক্ষ্য করেছে বিল্টুর অসুবিধে। কিন্তু এত সকালে তো সে বিছানা ছাড়ে না।

—খালি পায়ে ঘুরছে কেন, কাঁটা ফুটতে পারে।

—এই জায়গাটায় মেন মনে হচ্ছে, পা পাখতে গেল ঝিনঝিন করছে।

—ওদিকে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে। কিছু আশঙ্কা না করেই রাখল। মনে হল না কোন অসুবিধে লাগছে। মনে হল মাটিটা একটু অন্যরকম। একটু কি গরম গরম? এই অন্যরকম কিংবা গরম গরম ভাবটা কি ঠিক ধরতে না পারলেও হার মানল না। বলল—

—কই কিছু তো মনে হচ্ছে না।

—ঝিনঝিন করল না? তাহলে কি আমার মনে ভুল?

—এই তো আমি দুপা দিয়ে দাঁড়িয়েছি। এস না, এস, ভয় কি?

পারল না বিল্টু, বার কতক চেষাট করে হাল ছেড়ে দিল। বয়ে ভয়ে একবার কা পা রাখছিল জায়গাটায়, সেঙ্গে সঙ্গে টেনে নিচ্ছিল। তার কাণ্ড দেখে হাসি চেপে রাখতে পারছিল না মিতু। এমন একখানা বড় জুটেছে তার, বাচ্চারও অধম। ভীতুর ডিম। কিন্তু সত্যি কেমন একটা মনে হচ্ছে, অস্বস্তিকর অনুভূতি। সেটা কি খালি পা মাটিতে রাখার জন্যে? পায়ের তলায় গরম লাগছে, সামান্য হলেও কিছু গরম। অল্প, তবে নিশ্চয় একটা কিছু হচ্ছে। পিছিয়ে এল মিতু।

দুজনেই চটি গলিয়ে চলে এল দোতলায়। দুজনেরই মনের ভেতর চলছিল কী হতে পারে, কী থাকতে পারে ওকানটায়? গতকালই ক্লিক্স গ্যাসের সঙ্গে চা চিনি আরও অন্য অনেক জিনিষ কিনে এনেছিল মিতু। রান্নাখরটাকে আগে সাজিয়ে নিতে হবে। না নিলে নিজেদেরই মুস্কিল। ছোট বাচ্চা আছে একটা। তাছাড়া তার বরটি বাচ্চারও অধম। তিনি আবার জাহাজে হুকুম করে করে অভ্যস্ত। তিনি মনে করেন মুখে বললেই সেটি তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। কে করে, কীভাবে করে, এসবে তাঁর কৌতুহল নেই। এই বাড়িতে গত ত্রিশ বছর কেউ বাস করেনি। মনে করে নিতে হবে এটা একটা ছাত আর মেঝের কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তার শাশুড়ি দিদি-শাশুড়িরা গুছিয়ে সংসার করতে জানতেন। বাসন বিছানা পেয়ে গিয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়েছিল তাঁদের উদ্দেশ্যে। শুধু তাই নয়, সংসারের অনেক টুকিটাকি জিনিষ পাওয়া গেছে। যেমন বঁটি। যদিও বঁটি আজকাল বেশি ব্যবহার হয় না, ছুড়িতেই কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে মেয়েরা, তবু বঁটি দেখে তার ভাল গেলেছিল ঠিকই।

সবথেকে ভাল লেগেছিল কাল রাতের সময়টা। ওকে নিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। দূরে রাস্তার আলো ছাড়া আশেপাশের বাড়ি সামান্য একটা দুটো আলো চারপাশটাকে নিবিড় মায়াময় করে রেখেছিল। ঝিম ধরা রাতটাকে অদ্ভুত সূক্ষ্ম জালে বন্ধ করে রেখেছিল, যার মধ্যে তারা দুজনেও আটকে ছিল। ঝাঁক ঝাঁক তারারা এত কাছে নেমে এসেছিল যেন মই লাগিয়ে পেড়ে আনা যাবে। দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশটা বাচ্চার হাতে আঁকা পাহাড়। দিনের আলোয় যা অসুন্দর, রাতের বেলা তাই মোহ সঞ্চার করে। তবে তার কারণও আছে। তার বরটি পাশে রয়েছে, বাড়িটি তার নিজের, আর একটু আগে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে তার পাওনা আদায় করে নিয়েছে।

কেবল নিচের তলাটায় ভাড়া ছিল, ওপরের সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল গেট তালাবন্ধ ছিল। ওপরের ঘরগুলোও তালাবন্ধ ছিল। বাসনপত্র সব আছে। বিছানাপত্রও সব গুছিয়ে রাখা আছে। বাবার সময় থেকে সব পড়ে আছে যেনকার তেমনি। কিন্তু কি সুন্দর করে মস্ত কাঠের সিন্দুকে রাখা ছিল বিছানাপত্র যে এত বছরেও কোন ক্ষতি হয়নি। মা কি জানতেন তাঁর বৌমা একদিন এখানে আসবে, এসব তার কাজে লাগবে। মা কি জানতেন তাঁর নাতির পা পড়বে এই বাড়িতে এবং সে দৌড়ে বেড়াবে এবাড়ির ঘরে ঘরে।

এখন মিতুর মাথায় একটা ভাবনা বার বা খেলছে, নাগপুরের পাট উঠিয়ে সিউড়িতে এসে থাকা ঠিক হবে কী না। এটা বেঙ্গল, অনেক আত্মীয়রা আছেন। সিউড়ি থেকে ট্রেনে মাত্র চার ঘন্টায় কলকাতা। নিচের তলাটা ভাড়া নেবার জন্যে আর একটা ব্যাঙ্ক থেকে চিঠি এসে গেছে ওদের কাছে। এইরকম কাউকে ভাড়া দিয়ে দিলে অসুবিধে হবে না। ওপর তলাটা বিশাল। সামনে পেছনে ঢাকা বারান্দা। বেডরূপ দুটো মস্ত বড় বড়। ড্রইং রুম, কিচেন বাথরুমগুলো বেশ বড় বড়। নাগপুর থেকে গাড়িটা নিয়ে এলে মিতু নিজেই পারবে। এখানে প্লে-স্কুল কোথায় আছে খবর নিতে হবে।

আর সবচেয়ে ভাল এখানে সব কিছুই কাছে কাছে। হিংনায় কাজের লোক পাওয়া যায় না। কে আসবে অমমন ধ্যাদ্ধেড়ে জায়গায়? এখানে কালকে দুপুরে পৌঁছেই লোক পেয়ে গেছে। দরকার পড়লে বউটা সারা দিন থাকবে বলেছে। এক দিনেই বাসযোগ্য করে দিয়েছে পুরো দোতলাটা।

চা খেতে একদম ইচ্ছে করছিল না। ব্যাপারটা যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে। ওখানে ওই রকম হচ্ছে কেন? তারই বা কেন লাগছে, মিতুর কেন লাগছে না? কিছু বোঝা যায় না, কিছু বুঝতে পারা যায় না। শ্রী বিল্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এমন মনের অসুখের শিকার? এইজন্যেই মাঝে মাঝে মিতু বলে

—তুমি অকারণ ভাবনা করা ছাড় দেখি, দেখবে সব নিয়ম মত ঠিক হয়ে গেছে।

নিয়ম মত ঠিক হয়ে একটা কি ধরনের কথা? নিয়ম মত মানে তাহলে কি দাঁড়াল, অকারণ ভাবনার উল্টো? ভাবনা ছেড়ে দিলে তখন নিয়ম মত চলে সব, এটা কী একটা কথা হল? বিল্টু বলল—

—চা খেয়ে আমি আর একবার ওই জায়গাটা দেখতে যাব। তুমিও এস। আমারই বা অমন ঝিনঝিন ভাব হয়ে কেন? তোমার

কেন হবে না? আমি নিশ্চয় মিথ্যে বলছি না, কিছু হচ্ছে বলেই বলছি। তাহলে তোমার কেন হচ্ছে না? তোমার শরীরের সঙ্গে আমার শরীরের কোন তফাৎ আছে কী? থাকলে সেটা কী ধরনের তফাৎ আমাকে জানতে হবে। আর একটা জিনিষ আমার আশ্চর্য লাগছে। সব জায়গা ছেড়ে ওখানেই বা এমন হচ্ছে কেন। ওই জায়গার বিশেষত্ব কী? কী আছে ওখানে আমাকে জানতে হবে।

নীচে নেমে গেল বিল্টু। পেছনের বাগানে আবার সেই জায়গায় গিয়ে পা রাখল। আবার তার সত্যি সত্যি জোরে শক লাগার মত মনে হল। একটা কাঠি নিয়ে দাগ দিল সেই ঠিক কোনখানে কোনখানে ওইরকম ইলেকট্রিক্যাল লিকেজ হচ্ছে। মাটির নীচে কোথাও ইলেকট্রিকের তার আছে।

পুলুর গলা পাওয়া গেল, উঠে পড়েছে ছেলে। ত্বরিৎপদে চলে গেল মিতু। এখন তার অনেক কাজ। ছেলেকে বাথরুম করানো, মুখ ধোয়ানো, জামা প্যান্ট পাল্টানো, দুধ গরম করে খাওয়ানোর পাট চলবে।

নীচে নেমে গেল বিল্টু। পেছনের বাগানে আবার সেই জায়গায় গিয়ে বা রাখল। আবার তার সত্যি সত্যি জোরে শক লাগার মত মনে হল। একটা কাঠি নিয়ে দাক দিল সে ঠিক কোনখানে কোনখানে ওইরকম ইলেকট্রিক্যাল লিকেজ হচ্ছে। মাটির নীচে কোথাও ইলেকট্রিকের তার আছে। সেখান থেকে লিক করছে কারেন্ট। টেকনিক্যাল মানুষ সে, সুতরাং এই সামান্য জিনিসটা নিয়ে বেশি ভাল না। পুল যদি এসে শক খায় এই চিন্তাটা প্রথমেই পাক খেল মস্তিকে। একটু একটু সরে সরে শক লাগার পুরো জায়গাটা কাঠি দিয়ে দাগ দিল। যে জায়গায় প্রথমেই পাক খেল মস্তিস্কে। একটু একটু সরে সরে শক লাগার পুরো জায়গাটা কাঠি দিয়ে দাগ দিল। যে জায়গায় শক লাগছে সেটা বেশি বড় নয়, মাত্র তিন ফুট বাই সাত ফুটের মতো আয়তাকার। এবং জায়গাটা পেছনের দেওয়ালের খুব কাছে। দেওয়ালের ওপাশে একটা দোতলা বাড়ি, তাদের মতই। ধাঁ করে কেমন করে মাথায় খেলল আয়তক্ষেত্রটা দেখতে অনেকটা কবরের মতো। থাকতে পারে, এবাড়ির পেছনের বাগানে আয়কার ক্ষেত্রের মধ্যে কোন শুদ্ধ আত্মা থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই। নিশ্চিন্ত মনে নিজের ইচ্ছায় সে যদি থাকতেও তাতেও কারো কিছু বলার নেই। এ তো আর জাহাজের টুল রুম নয় যে সেখানে ঢুকে ছ্যাঁৎ করে উঠবে বুক। ওখানে পা দিলে হয়ত ওঁদের ভাল লাগে না, আর কোনো বিশেষত্ব নেই।

ভাল করে দেখল বিল্টু, এপাশ ওপাশ জরিপ করল। বিজলি বাতির কোন পোল নেই, কিংবা মাটির নীচ নিচ কেব্‌ল যাবার সম্ভাবনাও কম। সকালের রোদ এসে পড়েছে তার গায়ে। একবার দাগের ওপাশে হাত দিয়ে ছোঁবার চেষ্টা করল। কী আশ্চর্য, কোন শক লাগল না। আরও দুতিনটে জায়গায় হাত দিল সে। নাঃ, কোন ভুল নেই। হাতে শক লাগে না, কেবল পায়ে লাগে। চিন্তা হয়ে গেল তার। বুদ্ধি দিয়ে এর কোন মানে খুঁজে পেল না। কাঠি দিয়ে গাগটা স্পষ্ট করে টানল দুবার করে। পা দিয়ে টেস্ট করে দেখল, হাত দিয়েও দেখল আবার। কোন ভুল নেই, পায়ে শক্ লাগে হাতে লাগে না।

রোদ্দুর উঠেছে, মুখে লাগছে। ছায়া দেখে একটা জায়গায় দাঁড়াল বিল্টু। মনে মনে হিসেব কষে দেখল ওই জায়গাটায় শক্ লাগে, কেবল পায়ে লাগে, হাতে লাগে না, মিতুকে লাগে না। কেন এমন হয়? তিনটি জিনিষের কথা মনে এল, বিদ্যুৎ, ঈশ্বর কিংবা আত্মা। তিনজনেরই শক লাগানোর মতো চরিত্র, তিন জনই ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিজের চিন্তার স্রোতের বহর দেখে নিজেই হেসে উঠল। এই সময় ওকে হাসতে দেখলে যে কেউ ভাববে লোকটার মাথায় ছিট আছে। হয়ক। অন্তত মিতু তাই বলে। সবসময় জলে জলে কাটাতে হলে মাথায় অমন ছিট হওয়া স্বাভাবিক।

গেট খোলার আওয়াজ হল। কাজের বউটা এসেছে। মতলব আছে বউটার, মতলব হল এই বাড়িতে কাজ করতে চায় সে। প্রথম দিনেই বুঝে ফেলেছে এখানে কাজ পেলে তার অনেক সুবিধে হবে। মিতুকে বোজাচ্ছে সিউড়িতেই থেকে যেতে। কোন কিছুরই অভাব হবে না সিউড়িতে। কিন্তু এসব চিন্তার বিষয় নয়, চিন্তার বিষয় হল পুলু যেন ঐদিকটায় না আসে সেটা আগে দেখতে হবে। এখন মিতুর নীচে আসার চান্স নেই। এখন তার অনেক কাজ, অনেক পরিকল্পনা।

সত্যি মিতু আর পুলু যদি এবাড়িতে এসে তাকে তাতে অসুবিধে কী হবে? কথাটা ভাববার বিষয়। নাগপুরে হিংনায় থেকে বিশেষ কোন লাভ আছে কী? পয়েন্ট, বেশ ভাল পয়েন্ট। তার আগে কাল একবার ওদের চিঠিটা নিয়ে যেতে হবে টিনবাজারে, করপোরেশন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে। ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলতে হবে। লীজ এগ্রিমেন্ট করার জন্যে একজন উকিলের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। কিন্তু এখানকার ইলেকট্রিক লিকেজের কি করা যায়?

শুধু বিছানাপত্রেই নয়, ঘরের ভেতরেও একরকমের গন্ধ রয়েছে। সেটা বহু দিন ধরে ঘর বন্ধ থাকলে হবেই। যদিও ঘরে ইঁদুর চামচিকে মশা মাছি ঢোকার রাস্তা ছিল না, ভিজে হাওয়া আটকানো যাবে কী করে? অতএব গন্ধ একটা হবেই। কী ভাগ্যি বৃষ্টি জল ঢোকেনি, সামনে পেছনে বারান্দা থাকায়, নইলে অবস্থা আরও খারাপ হত।

দাদুর আমলের খাট, এত বড় যে তারা তিনজন শুয়েও আরো দুজন অনায়াসে শুতে পারে। খাটের ওপর কাল যেমন তেমন করে তোষকগুলো পেতে শোয়া হয়েছিল। নতুন চাদর চাই। তাছাড়া এতদিনের পুরোনো সব বিছানা থেকে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ ছাড়ছে, শক্ত শক্ত হয়ে গেছে ওগুলো। রান্নাঘরের কলটা পুল খুলছে আর বন্ধ করছে। বেশ খেলা পেয়েছে নতুন জায়গায় এসে। মঙ্গলা বউটা ভাল বলতে হবে। নিজে নিজেই কাজ ঠিক করে নিতে পারে। রান্নাঘরের ওদিকে বারান্দাটা ধুয়ে দিচ্ছে। ওখান থেকেই বলল—

—বউদি, দাদাবাবু বাগানটোয় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইছে কেনে গো?

—তুই কী দেখতে পাচ্ছিল নাকী রে?

—হ্যাঁ গো। ওই তো, দেখা যেছে জি।

—মাটিতে কারেন্ট আছে ওখানে। সকাল থেকে তাই নিয়ে পড়েছে।

—হেই মা গো, মাটিতে কারেন্ট ? বল কি বউদি ?

—তবে আর বলছি কী ? তোর দাদাবাবুর পায়ে শক লেগেছে। খালি পায়ে ঘুরছিল সকালে। এত দিনের বাড়ি, কত গোলমাল বের হবে এখন দেখ্।

বলতে বলতে পেছনের বারান্দায় এসে দেখল সত্যি কি করছে তার বর। সত্যি করে বলতে গেলে একরকমের ভালবাসা গড়ে উঠেছে ওই লোকটার জন্যে। সারাজীবন জলের ওপর কাটানো অত সাজা নয়। এই নিয়ে কত রকম গল্প করেছে ওর সঙ্গে। জলে থেকে থেকে কত মানুষ বেশ অন্য রকমের হয়ে যায়। ডাঙায় এসে তাদের কি রকম লাগে। প্রথম প্রথম ওরও হয়েছে। ঠিকমত অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারত না। ঠিকমত কথা বলতে পারত না। সাথে জাহাজীরা মদ খেতে শুরু করে ? তারপর মেয়েমানুষ পাবে কোথা জলের ওপর ? কত রকম উদ্ভট ব্যবহার করে তার ঠিকানা নেই। মাটির জীব, জীবনের অর্ধেকটা সময় জলে জলেই কাটায়, মানুষ তো ! বিল্টু এক একবার জায়গাটার দিকে দেখছে, আবার অন্যদিকে তাকাচ্ছে। করুক যা ইচ্ছে, ভাবুক একটু। নিজের মনে থাকুক না। ওকে চিনতে তো বাকি নেই। নিজের মনে থাকলে ভাল থাকে। হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে ওকে দেখে বিল্টু হাসল। বেশ জোরে বলল-

—পুলু কি করছে ?

—খেলছে।

—ওকে এদিকে আসতে দিও না। খেয়াল রেখো।

কে জানতো ওই কথাটাই পুলু শুনে ফেলবে। রান্নাঘরের কল ছেড়ে বারান্দায় এসে নিচের বাগানে বাবাকে দেখে ফেলল। দৌড়াল সিঁড়ির দিকে। তিন বছরের হয়েছে, সামলানো যায় না সহজে। একটা একটা করে দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়িগুলো নামতে থাকল।

আর কোনো জায়গায় এইরকম শক লাগার ব্যাপারটা হচ্ছে না তো ? কথাটা মাথায় এলে বিল্টুর। সামনের দিকে হলে অনেক আগেই ধরা পড়ত। লোকজন যাতায়াত করেছে এতদিন ধরে। পেছনের দিকের পুরো বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বিশেষ করে গাছতলাগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পা দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল আর অন্য কোন জায়গায় লিক হয়নি। পেছন ফিরে দেখে অবাক। সামান্য কিছু ঝুরঝুরে মাটি নিয়ে এসেছে পুলু। সে - কটি দুহাতে করে নিয়ে উপু হয়ে বসেছে দাগ দেওয়া এলাকার ঠিক মধ্যেখানে। নিজে মনে মাটিগুলোকে ফেলছে, যেন অঞ্জলি দিচ্ছে। তার গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট। তার শক লাগার মত কিছু হয়নি, হলে তক্ষুনি চেঁচাত।

সাবধান হল বিল্টু। একদম উত্তেজনা দেখানো যাবে না, ভয় পাবে পুলু। বরঞ্চ আস্তে আস্তে ডেকে নেওয়া উচিত হবে। বিল্টু নিজে তো ওই জায়গায় যেতে পারবে না। সুতারং ডাকল ছেলেকে।

—এখানে এস পুলু, একটা জিনিস দেখাব।

—আমি এখন খেলছি।

বিরক্ত লাগে। বললেও কথা শোনে না ছেলে। যদি কিছু হত, যদি শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত ? কি যে করে না এরা। এগিয়ে গেল সে। কি করা উচিত তায়ই নিয়ে সামান্য চিন্তা করল। কিন্তু পুলুর কিছুই হয়নি যখন, থাক না, খেলুক ওখানে। ওর দিকে সংশয় ভরা চোখে তাকিয়ে রইল একভাবে। অজান্তে মাথা চুলকোচ্ছিল বিল্টু। বাপ ছেলের মাঝে কাঠির দাগ ঘেরা কবরের মত জায়গাটা চেয়ে দেখছিল ওদের।

—ওমা পুলু কোথায় গেল ? মঙ্গলা দেখেছিস ?

—নীচে দাদাবুবুর কাছে খেলছে। ওই তো।

উঁকি মেরে দেখে মজা লাগল মিতুর। তার ছেলে একটা জায়গায় গুছিয়ে বসেছে, ছেলের বাবা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা চুলকোচ্ছে, মনে হয় ভাবছে কি করা যায়। তখনই মনে পড়ল ওই জায়গাটাতেই তো ওর শক লেগেছিল। তারও কেমন কেমন লেগেছিল। বিল্টু কেন ওকে তুলে নিচ্ছে না ? পুলুর নিশ্চয়ই কোন কিছু হয়নি। অবশ্য তার ওই কেমন কেমন লাগাটার মূলে বিল্টুর শক লাগার গল্প হয়ত বেশি কাজ করেছিল। যত্তো সব ভয় ভয় বাতিক। সে যাই হোক। এখন ছেলেকে চান করানোর আগে খেলুক না মাটি ফাটি নিয়ে। ক্ষতি কি, বাচ্চারা মাটি মাখলে উপকার হয়, বাপ ছেলে মিলে খেলুক যকক্ষণ মন চায়। মিতু বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে গেল। হাতে কত কাজ ! পুরো দোতলাটা ভাল করে ধোয়াতে হবে, পোঁছাতে হবে। জলখাবারের ব্যাপারটা দেখতে হবে। একবার বাজারের দিকে যেতে হবে, কিন্তু তার আগে কী চাই তার লিস্ট বানাতে হবে।

দেওয়াল আলমারিতে মশারি চাদর তোয়ালে বালিশের ওয়াড় সব সাজানো, সব কাঠ কাঠ শক্ত শক্ত। কতদিন কেউ হাত দেয়না, কতদিন কেউ ভাঁজ কোলে না। ব্যবহার না করলে অমন হবেই। তবু তো আছে, রাখা আছে যত্ন করে। আলমারি খোলার পর আলো হাওয়া পেয়ে তারা যেন হেসে উঠল। এই তো এসেছে, কত দিন পর এবাড়িতে মানুষ এসেছে।

দাদা-শ্বশুরের খাটের উপযুক্ত অতবড় বিছানার চাদর পাওয়া যাবে না, দুটো করে চাদর লাগবে। প্লেট চামচ টিস্যুপেপার খাবার জলের বোতল চাই। রান্নার বাসনগুলো মস্ত মস্ত। কড়াইগুলোত দশজনের মত তরকারি রান্না করা যায়। ছোট জিনিস সে সময় বোধ হয় কেনা হত না। এক ছেলের সংসার ছিল, বাসন কিনেছে দেখ দশজনের উপযুক্ত। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করেছে। সেই সময়কার যুক্তিগুলোকে মনে মনে সাজাল মিতু। বাসনের সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো নামাতে লাগল একটা একটা করে। কালো কালো হয়ে আছে কাঁসার বাসন, পেতলের গামলা। ওগুলোকে মাজাঘষার কোন দরকার নেই। লোহার চিনটে সাঁড়াশি খুন্তি হাতাগুলো কাজে লাগবে। সবচেয়ে নীচে লোহার হামান-দিস্তা, যেমন বড় তেমনি ভারি। যা খুঁজছিল তা পেল না। সে সময় কী চামচ টামচ ব্যবহার হত না ? কে জানে বাবা ! একটু বড় সাইজের কয়েকটা চামচ পেলেও কাজ হত। কী ঝকঝকে রোদ এসেছে ঘরের ভেতর অব্দি। সব জানালা দরজা খুলে ধুলো ঝুল মাটি পরিষ্কার করছে মঙ্গলা। গাছমোমর বেঁধে লেগেছে

কাজে।

কথা কাটাকাটি, শেষে ঝগড়া হয়ে যায় দুদুর সঙ্গে। রাতের দিকে এসে কাস্তে দিয়ে গলা কেটে খুন করেছিল ঠাকুমার চোখের সামনে। ধরা পড়েছিল লোকটা, নেপাল থেকে তাকে ধরে আনা হয়। অপরাধ স্বীকার করেছিল সে। জেল হয় তার, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

—তোমার কি ধারণা দাদুর আত্মা আছে এখানে?

—থাকা স্বাভাবিক। আমরা জাহাজীরা খুব আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

—তোর ছেলে মেয়ে কটা রে?

—তিনটে বউদি, বড়টা মেয়ে, দশ বছরের হল।

শুরু হয়ে গেল। দুটো হাতের সঙ্গে মুখ চলল সামনে। প্রথমে ছেলে মেয়ের গল্প, তারপর বরের কুলুজি, এবং শ্বশুরবাড়ির মুণ্ডপাত করে ঢকঢক করে কলের জল খেল মঙ্গলা। ভ্রু কুঁচকে জল খাওয়া দেখল মিতু, এদের বোধহয় কোনো ইনফেকশন হয় না। কেমন সোজা মুখ করে জল খাচ্ছে। কবেকার বাসি জল তদার ঠিক নাই। আর একবার উঁকি মেরে দেখে নিল বাপ ছেলের কাণ্ড। আশ্চর্য ব্যাপার, বাপ বসেছে ছেলের ঠিক সামনে, বাবু হয়ে বসেছে এবং ওর নিশ্চয় এখন শক টক লাগছে না। কি কাণ্ড!

মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে এল মিতু।

বিল্টুকে যদি দেখত মিতু, যদি দেখতে হাতের ওপর ভর দিয়ে পা না ঠেকিয়ে তার বসার কায়দা তাহলে হেসে কুল পেত না। বসার আগে বিল্টুর একবার মনে হয়েছিল যদি শক লাগে তখন কী করবে? লাগেনি, কোনরকম অসুবিধে হয়নি। অতএব ওই প্রসঙ্গের ওখানেই ইতি। ও নিয়ে আর ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু প্রবলেমটা রয়ে গেল। কেন হচ্ছে তার হদিস পাওয়া গেল না।

ছোট ছোট হতে শে কিছু মাটি সংগ্রহ করেছে পুলু। সেগুলোকে ঢিপির মত করেছে। তার ওপর হাত দিয়ে চামড় মারছে। মুখে গেঞ্জিতে ধুলো মাটি লেগেছে। বিল্টু বলল—

—মা বকবে পুলু, মুখে কত ধুলো মেখেছ।

—বকবে না।

—কেন বকবে না?

—বাবার সঙ্গে খেললে বকে না।

বালক নিজের মত করে শিখে নিয়েছে বাবা থাকলে তার ভয়ের কিছু নেই। মিতু হয়ত তাকেই বকবে আস্কারা দেবার জন্য। বলল—

—তাহলে বাবাকে বকবে মা।

—বাবাকে কেউ বকে না।

—মা বকবে।

—বাবা তো বড়।

তার মানে যেহেতু বড় সেইহেতু বাবাকে মা বকতে পারে না। মজা পেল বিল্টু। বলল—

—মা বড় না বাবা বড়?

—বাবা বড়।

—আচ্ছা, এবার আমরা গাছে জল দেবো। চল।

এবার কথা শুনল পুলু। সহজভাবে দাগগের বাইরে চলে গেল। মাটিতে না পা রেখে হাতে ভর দিয়ে পার হল বিল্টু সরলরেখাটা। সরলরেখাটা সত্যি সরহল সবার কাছে, কেবল তার পক্ষেই অস্বস্তিকর। মিতুর কথা অনুযায়ী ভয় করাটা তার একচেটিয়া ব্যাপার। কিন্তু এখানে যা হচ্ছে সেটা কারই সঙ্গে হচ্ছে কেন? সেটাও কী তার একচেটিয়া? ওইটুকু বালক পুলুরও কিছু হল না। আশ্চর্য! জলের জন্যে কলের দিকে যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ল তার। চমক লেগে গেল। সত্যি কী এমন হয়, না হতে পারে? মহিলা কিংবা বালকের কোনও দোষ হয় না কারও কাছে? খুব নিকট জলের কাছে। সে নিকট জন কে হতে পারে? বাবা মা দাদু ঠাকুমা এইরকম লোক। তারা তো বিল্টুরও নিকট জন। তবে?

দাদুর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। বাবা বলতেন তোর দাদুর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। দাদুর আত্মা আছে এখানে। হতে পারে, নাও হতে পারে। এই বাড়িতে আছে তাঁর অস্তিত্ব। হতে পারে, নাও হতে পারে। থাকলে ভাল, না থাকলে আর ভাল।

চায়ের কাপ আর মুড়ি-চানাচুরের বাটি নিয়ে মঙ্গলা সামনের বারান্দায় চলে গেছে। ইতিমধ্যে কিছু কাঁসার থালা বাটি গেলাস মাজা হয়েছে। কাঠের চেয়ারগুলো ঝেড়েঝুড়ে কিছুটা জুত করা হয়েছে। এবাড়িতে ডাইনিং টেবিল নাই। বিল্টু বলল—

—দাদুর মৃত্যু মেন করে হয়েছিল জানো?

—আমি কেমন করে জানব? দাদুর মৃত্যুর পর তোমার ঠাকুমাকে নিয়ে বাবা হিংনায় চলে আসেন এই পর্যন্ত জানি।

—দাদুকে ঐ বাড়িতে খুন করা হয়েছিল। আমি তখন দশমাসের ছেলে, হামা দিচ্ছি সবে। মায়ের কাছে শুনেছি খবর পেয়ে বাবার সঙ্গে আমি আর মা এবাড়ি এসেছিলাম। শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে এবাড়ির পাট উঠিয়ে দিয়ে সবাই মিলে নাগপুর চলে গিয়েছিলাম আমরা। তারপর বাবা দু-চারবার এসেছে, বিলি ব্যবস্থা করে গেছে। আমি ঠাকুমার কাছে বড় হয়েছি। আমি যখন দশ বছরের তখন ঠাকুমা মারা যান। একদিন স্কুল থেকে বিরে দেখি ঠাকুমার মরে গেছে। আমি খুব কেঁদেছিলাম।

—দাদুকে কেন খুন করেছিল?

—দিবাকর মণ্ডল নামে একটা লোক। যে জমিটার ওপর বাড়ি করেছিলেন দাদু সেটা ছিল দিবাগরের বাবার সম্পত্তি। তার তিন ছেলে। দুজনকে পাওয়া গিয়েছিল, জমির দাম দুভাগে ভাগ করে তাদের দিয়েছিল উকিল বাবু। সে সময় দিবাকর ছিল নেপালে। বহুদিন তার কোন খবর ছিল না। ততদিনে বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। দাদু ঠাকুমা এখানে থাকেন আর বাবা মায়ের সঙ্গে আমি হিংনায়। দিবাকর এসে দাদুর কাছে টাকা দাবি করে। সেও সম্পত্তির ওয়ারিশ। দাদু দেবে কেন? লোকটার একটা ছোট দোকান ছিল নেপালের পোখরাতে। টাকা পেলে ওর উপকার হত।

কথা কাটাকাটি, শেষে ঝগড়া হয়ে যায় দাদুর সঙ্গে। রাতের দিকে এসে কাস্তে দিয়ে কলা কেটে খুন করেছিল ঠাকুমার চোখের সামনে। ধরা পড়েছিল লোকটা, নেপাল থেকে তাকে ধরে আনা হয়। অপরাধ স্বীকার করেছিল সে। জেল হয় তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

—তোমার কি ধারণা দাদুর আত্মা আছে এখানে?

—থাকা স্বাভাকি। আমরা জাহাজীরা খুব আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তোমাকে তো কতবার এসব বলেছি। বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার।

—তোমার কী ধারণা দাদুর আত্মা আছে নীচের বাগানে মাটির নীচে?

—থাকতেও তো পারে। আমার শক লাগে তোমার লাগে না, পুলুর লাগে না। আমার পায়ে শক লাগে হাতে লাগে না। কী ব্যাখ্যা করবে এমন ঘটনার? ইলেকট্রিক কারেন্ট লিক করছে?

—তুমি যে বলেছিলে ওখানে অতক্ষণ ধরে?

—পা না দিয়ে হাতে ভর দিয়ে গিয়ে বলেছিলাম। আমি পুলু দুজন তার উত্তরপুরুষ। নিজের জন। ভয়ের কী আছে?

স্তব্ধ হয়ে গেল মিতু। না, তার অদ্ভুত বিশ্বাসের জন্যে নয়, তার সাহসের জন্য। মাটির নীচে আত্মা রয়েছে এমন অস্বাভাবিক কল্পনা করারর জনেও নয়, তার প্রচণ্ড ডেদী সাহসের জন্যে। কী সাহস! নিজের ছেলেকে নিয়ে মহানন্দে দাদুর আত্মার শক লাগা গরম কবরের ওপর খেলা করে এল এতক্ষণ ধরে। একে কী করে ভীতু ভাবছিল? মনে মনে কিছুটা বা করুণাই করছিল? এর মত সাহস নেই তার। এখন ভাবতে রীতিমত ভয় করছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বারান্দার বাইরে একবার ভাল করে চেয়ে দেখল মিতু।